শাড়ির রঙ্ লাল

নলিনী বেরা

আমাদের 'বাখুল'টা যেমন বড়, আমাদের গ্রামটাও তেমন বেশ বড় আর বিচিত্র। মাঝখানে 'কুল্হি' রাস্তা, দুধারে ঘর, গ্রামখানা উত্তর - দক্ষিণে টানা প্রসারিত আর প্রসারিত। বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনো কারণে জেলার মানচিত্র, মানচিত্র তো নয় 'ম্যাপ্', ম্যাপ্ খোলা হলে গ্রামের বৃদ্ধরা তো বটেন, ছোট ছোট ঢ্যাঙ্না-ম্যাঙ্নারা, এমন কী 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুম' রাও (সাধের' তো নয়, এখানে একটা অশ্লীল কথা আছে) হুমড়ি খেয়ে পড়ে, 'দেখি ত দেখি, আমাদের গ্রামের নামখানা আছে কী না?' আবছা হলুদ রঙের উপর এক জায়গায় কালো ফুটকি, তার উপরে জ্বল জ্বল করছে আমাদের গ্রামের নাম! 'আছে' 'আছে' বলে চিৎকার ফেটে পড়বে না উল্লসিত দর্শককূল? কেউ কেউ আবার আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হয়ে দাবীও করে রসে, 'দেখিস ভূগোল বইয়েও আছে—ঐ যেমন 'বার্ণপুর কোথায় এবং কী জন্য বিখ্যাত' 'রাউলকেল্লা কোথায় অবস্থিত ও কী জন্য বিখ্যাত?' নাহ্, অতদূর কী আর আছে! আমাদের গ্রাম তো আর তেমনও নয়, এই যেমন— ''সুবর্ণপুর গ্রামটা বর্দ্ধমান জেলায় একটা বেশ বড় গ্রাম। অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস; গ্রামের লোকের মধ্যে উকিল, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, জজও আছেন, তাঁহারা বিদেশে কার্য্য করেন; গ্রামেরই একটা লোক, জ্ঞানেন্দ্র নাথ দে, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্, বি, পাস করিয়া গ্রামেই ডাক্তারী করেন; গ্রামে স্কুল আছে, একটা ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে, তাহাতে একজন এল্ এম্ এস্ পাস করা ভিন্ন জেলার মুসলমান ডাক্তার আছেন।' এম্, বি, এল্ এম্ এস্ তো দূর অস্ত, থাকার মধ্যে আছেন এই হ্যাট্-কোট্-পরা ভবানী ডাক্তার, তিনি না এ্যালোপ্যাথ্ না হোমিওপ্যাথএ। আর আছে ভোলানাথ দণ্ডপাট, তিনিও না হোমিওপ্যাথ্ না 'রে মনুয়া ভাই' 'রে মনুয়া ভাই'র পালাকার। তাও তো আমাদের গ্রামের না, পাশের গ্রামের। তা হোক, তবু আমাদের গ্রাম নিয়ে গ্রামবাসিদের গর্বের অন্দ নেই। আর গ্রামবাসি বলতে —ঐ ত ক'ঘর সাঁওতাল, ভুঁইয়া-বুমিতা-করণ, কাম্হার-কুম্হার, রাজু সদ্গোপ - কেঁওট - কৈবর্ত হাড়ি - ডোম- বাউরি, একটু দুরে জঙ্গলের ভিতরে তাঁতি - তামলী - মাহাতো আর লোধারা। কাজে - অকাজে ব্যবসায়- বাণিজ্যে বিবাহে, কুটুম্বিতায় পথ হারিয়ে - ভুলে - বেভুলে গ্রাম ছেড়ে অনেকে অনেক দূরে চলে গিয়েও। আমাদের গ্রামের লোক, এমন কী আশপাশের গ্রামের লোকও 'নিবাস কোথায়' জিজ্ঞাসার উত্তরে এককথায় যদি আমাদের গ্রামের নাম করেন, তবে প্রশ্নকর্তা শশব্যস্ত হয়ে উত্তরদাতাকে খাতির করে বসতে দেন, ফিরবার পাথেয় না থাকলে চালটা- মূলাটা এমন কী নগদ টাকাকড়িও হাতমুঠোয় জোর করে গুঁজে দেন। গ্রামের নামে পড়ে পাওয়া এই যে আঠার আনা—তাই বা কম কী!

ঘর থেকে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি আর ছোটকাকা বেরুচ্ছি, পিছনে পিছনে কিছুটা এগিয়ে এসেছেন আমাদের মা-কাকিরা ''ভালোয় ভালোয় যাস'' ''সাবধানে যাস'' ''শহর-বাজারে লোকজনের ভিড়ে ছোটকাকার হাত ধরে থাকিস'' ইত্যাদি বলতে বলতে, আর দেখি কি 'কুল্হি' রাস্তার ওধারে, উত্তর দিকে, প্রমথদাদের ভাবুর গাছটার ডালে একটা কাক বসেছিল, সাঁ করে যেই উড়ে গেল অম্নি তার ডানা থেকে একটা পালক খসে পড়ল। ঘুরে ঘুরে পড়বি ত পর একেবারে আমার মায়ের পায়ের কাছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল বৈকি ডাঙাসাহির সাঁওতালপাড়ার বুধনের মায়ের শকুনের পালকের কথা। আমি সন্তর্পণে পালকটা তুলে ব্যাগে রাখলাম আর শিহরিত হলাম এই ভেবে যে, হোক না কাকের পালক কখন কী থেকে কী হয়, ব্যাগের ভিতর দিয়ে পালকটার সঙ্গে আমার যাহোক স্পর্শযোগ ঘটল। তার গুণেই কী না জানি না প্রমথদার ছোট বোন রসনা, ফোর-অব্ধি-পড়া, যে কী না কখনও ফ্রক্ ছাড়া শাড়ি পরে না, একটা লাল কটকটে 'খুরদা' (ওড়িশার কোনো জায়গার নামে নাম) শাড়ি পরে, বোধহয় তার বউদির শাড়ি, আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আর তারপর থেকে যেদিকেই তাকাচ্ছি—লাল শাড়ি পড়া রসনাকেই দেখছি! রসনা, রসনা। এই কদিন আগে প্রমথদাদের গোরুবাগাল 'দামু' একটা কাণ্ড করেছিল যার দরুণ রসনা আর আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না, আমিও তাকে 'অঙ্ক' ও অন্যান্য পড়া দেখানোর অজুহাতে আর তাদের বাড়ি যেতে পারি না লজ্জায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেরোসিনের ডিব্রি জ্বেলে চটের আসনে পড়তে বসেছিল রসনা, তার সামনে একই আসনে বসে আমিও খুবই মনযোগ সহকারে তাকে পাটীগণিতের 'সরল সুদকষা' সুদে-মুলে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। ডিব্রির শিখা সধূম এঁকে বেঁকে জ্বলছিল, আর জ্বলছিল। রসনাদের ছাগলগুলো দড়ির খাটিয়ার নিচে এর-তার ঘাড়ের উপর শুয়ে আরামসে জাবর কাটছিল, 'ভাবুর' অর্থাৎ বাবলার বীজ খেয়েছে দুপুরে, তার এখন সুদে-মুলে উশুল তুলছে। খাটিয়ার উপর কে যেন শুয়ে, নিমসন্ধ্যাতেই নিদ্রামগ্ন। ডিব্রির আলোকিত বল ছাড়া ঘরের আর সবই অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার। অন্ধকার ফুঁড়ে আচমকা আলোয় এল গোরুবাগাল 'দামু', হাতে হোমিওপ্যাথ - শিশিতে যৎ কিঞ্চিৎ সরিষার তেল, হাতে পায়ে তৈলমর্দনই উদ্দেশ্য। আমাদের সামনে বসেই শুরু করল, তেল মাখাছিল আর আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রহস্যময় হাসছিল দামু। তারপর কী করে যে উল্টে গেল ডিব্রিটাও আলোর পরমায়ু শেষ, অন্ধকারের রাজত্ব! কোত্থেকে যে এত অন্ধকার এসে গ্রাস করল রসনাদের বাড়িটা! ছাগলগুলো কিন্তু বিরাম নেই, ''মসর'' ''মসর'' করে জাবর কেটেই চলেছে, কেটেই চলেছে। বড় জোর এর ঘাড় থেকে সরে গিয়ে ওর ঘাড়ে পড়ল। রসনারও কোনো বিকার নেই, উঠে গিয়ে 'দেশেলাই' এনে আলো জ্বালাবার উদ্যোগ নেই। কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দামুই যা বলল, ''যাই, আমিই তাহলে আলোটা জ্বেলে আনি।'' বলেই সে ডিব্রিটা হাঁতড়ে দূরবর্তী রান্নাঘরের দিকে রওনা দিল। গেল আর এল, এসেই দামু (ভাল নাম দামোদর) দার্শনিকের মতো ভাবসাব করে গভীর হয়ে বসে থাকল। বসে থাকতে একসময় ঢুলতে লাগল, তারপর তো খাবারের ডাক আসায় চলে গেল খেতে। তারপরেও আমি আর রসনা অঙ্কের কূটকচালি নিয়ে অনেকক্ষণ মেতে থাকলাম। 'সরল সুদ কষা' ছেড়ে 'জটিল মানসাঙ্ক', 'পাটিগণিত' থেকে 'শুভঙ্করী আর্যা', 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজে' 'কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজে'—। রাত বড় হল, রাত বাড়তে লাগল, ঝিঁঝিরা ডাকতে ডাকতে অবসন্ন হল, গোঠচাঁড়ের মাঠে করণতলা - পাড়িয়া - পাকুড়তলার বিলে অনেক 'কাঁকর' পড়ল, রাত ফুরিয়ে এল, ভোর হল, 'ভোর হল দোর খোল খুকুমণি ওঠে রে' 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে জামা ঐ' রাঙাভাঙা রোদ উঠল, আমি আর রসনাও ঘুম থেকে উঠে শুনলাম—বায়া'র বেটা 'দামু', রসনাদেরই ভাতে - কাপড়ের 'ভাতুয়া', মাঠে - ঘাটে- গোরুগোঠে এই বলে ঢি ঢি ফেলে দিয়েছে— ইচ্ছে করেই 'ডিভা' উল্টে আমি নাকি রসনাকে অন্ধকারে 'অসভ্য' করেছি! শোনা ইস্তক রসনা আর আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমিও পারতপক্ষে

রসনাদের ঘরে যাই না, তবে এসবই গোরুবাগাল ছাগলবাগাল পড়ুয়া-হাফ পড়ুয়া ইত্যাকার চ্যাঙনা-ম্যাঙনাদের মধ্যেকার দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী, বড়দের কর্ণকুহরে তার বিন্দুমাত্র প্রবেশ ঘটে না, নচেৎ কী করেই বা তার অব্যবহিত দুদিন পরেই রসনার বউদি তাদেরই বাড়িতে আমাকে রীতিমত নিমন্ত্রণ করে বলেন,' 'একবারটি দুপুরে আসিস, চেরদিন হল কুলডিহার কোনো খবর পাচ্ছি না, কে জানে তারা এত দিনে মরে গেছে কী বেঁচে আছে— একটা চিঠি লিখে দিস ত যাতে তাদের অন্তরটা হুদ্ হুদ্ করে কাঁদে!' কুলজিহা গ্রামে রসনার বউদির বাপের বাড়ি কী না আর এরকম হৃদয় বিদারক সৌজন্যে ঐ পিতৃদত্ত হস্তাক্ষর— 'হাতের লেখা হবে মাছকাটার মতো।'—

প্রমথদাদের বাড়ি ও 'ভাবুর' বা বাবলাগাছটা পেরিয়ে আমরা ক্রমশ 'নামো - কুল্হি' অর্থাৎ গ্রামের নিচের দিকে যেতে থাকলাম। আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম গ্রামে ঘরঘুলি ততই পিছিয়ে যাচ্ছিল, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু লাল রঙা 'খুরদা' শাড়ি পরিহিতা যাকেই দেখছি তাকেই মনে হচ্ছিল 'রসনা' ! এমন এমন যে 'বক্ড়িদি' যে কী না আড়ে দৈর্ঘ্যে রসনার দেড়গুণ, মাটিক কলসি - কাঁখে জল আনতে পাতকুয়োয় যাচ্ছিল, তাকে একঝলক দেখামাত্রই মনে হচ্ছিল 'রসনা'। রসনা, রসনা। যাচ্ছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে, আর আমরা যাচ্ছিলাম দক্ষিণ থেকে উত্তরে, স্বভাবতই বকড়িদির মুখ দেখা যাচ্ছিল না সোজাসুজি, কিন্তু যেই একবার ঘাড় ঘুরিয়েছে দেখি কী অবিকল রসনার মুখ বসানো। কথা বলতে পারে না বলে গয়াপ্রসাদের নাম রাখা হয়েছে 'গঁগা', গঁগার মা মারা গিয়েছেন সে কবে! তার বাপ বিহার মুলুক থেকে 'সাঙাল বউ' এনেছেন, পেশায় তিনি 'নাচনী, হাতে - পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঝুমুর গেয়ে নাচেন, একটা গান তো খুব 'পপুলার', ঐ যেঃ 'আমার যৌবনকালে বিনা তেলে রূপজ্বলে। মরি তাই ত ভাবি মনে মনে— আমার নব যৌবন গেল অকারণে।' গয়প্রসাদের নাচনী-মা তাঁর শাড়ি - শায়া - বডিজ্ দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আর কী আশ্চর্য সবকটাই লাল রঙের! মনে হয়েছিল বৈ কি 'রসনা' 'রসনা', কিন্তু সবই মাটি করে দিল গঁগা। সে তার সহজাত ভাষায় 'আঁ-ক্' 'আঁ-ক্' করে কত কিছুই বলে গেল, যেন জিজ্ঞাসা করল— আমারা কোথায় যাচ্ছি? আমিও তাকে হাত-পা নেড়ে অনেক কসরৎ করে বুঝিয়ে বললাম, 'যাচ্ছি নৈরাট পাটনা, চন্দন - চামরা আনতে।' আমার আচমকা মনে পড়ে গেল 'চম্পাবতী হরণ' পালার কথা, সত্যিসত্যিই 'হীরো'র মতো আমরা তো যাচ্ছি নিখোঁজ হওয়া হৃতা বা অপহৃতা পিসিমাকে উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে আনতে। বুধনের মা তাঁক 'কাহ্নি'তে বলেছিলেন কানে পালক গুঁজে ব্রাহ্মণ যখন গাঁয়ের ভিতর দিয়ে ভিক্ষা করতে করতে যাচ্ছিল তখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল— যারা ভিক্ষা দিতে আসছিল তারা কেউ 'কুকুর' কেউ 'বিড়াল' কেউ 'শূওর', সবাই মানুষ না। আমিও ব্যাগের ভিতর হাতমুঠোয় কাকের পালকটাকে চেপে ধরছি আর দেখি কী রাস্তার দুধারের মানুষজন ধীরে দীরে বদলে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে— ঐ তো কালীপ্রসন্ন, তার মুখের সামনে ঝিল্ ঝিল্ করছে একটা বলয়, কাঁপছে কাঁপছে, যেন রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বাহ্ন ঘাসের চাগড়ায় মাকড়শার জালের মতো শিশিরের 'জাসি' পড়েছে, টল্ টল্ করে, ছিঁড়ল ছিঁড়ল, এ্যাই এ্যাই— কেটে যাচ্ছে, কেটে গেল আর কালীপ্রসন্নর মুখ হয়ে গেল ভালুকের মুখ! এইভাবে মন্মথর মুখ শিয়ালের, পরিতোষের মুখ ষাঁড়ের—। ছোটকাকা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চোখ ছোট করে অত কী দেখছিল?' 'নাও এগিয়ে চলো দিকি!'

আমরা গ্রাম ছেড়ে গ্রামের বাইরে এলাম, আমাদের গ্রামের উত্তরদিকেও সাঁওতাল পাড়া, ভটা সাঁওতাল ধনু সাঁওতালদের ঘর। কতগুলো 'ঘুসুর' ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে বেড়ায় ধারে মাটি খুঁড়ছে আর কতগুলো সাদা রঙের মুরগী মাঝে মাঝে 'ক্যা-রাঁ-ও' 'ক্যা-রাঁ-ও' করে চিৎকার করতে করতে উড়ে উঠছে। হয়ত 'ঘুসুর' অর্থাৎ শূওরগুলো মুরগীর খোঁয়ারে ঢুকে পড়ে হামলা চালাচ্ছে, তাই। আমি ব্যাগের ভিতর হাত গলিয়ে কাকের পালকটাকে ফের হাতমুঠোয় চেপে ধরলাম— নাহ্ 'ঘুসুর' ঘুসুরই থাকল, 'মেরম' হল না আর মুরগীগুলোও ময়ূর কিংবা টিয়াপাখি হল না, কিন্তু যেদিকেই চোখ রাখছি খালি যে লাল দেখছি, 'খুর্দা' শাড়ি আর 'খুরদা' শাড়ি, লাল রঙই কেবলম! ঐ তো পুবে উদারডাঙার ওদিকটায় যে গেল, বগলে ঝুড়ি, হয়ত সে খেতিতে যাচ্ছে বৈতাল কী কাঁখুয়ার তুলতে— পিছন থেকে দেখে মনে হল অবিকাল রসনা যাচ্ছে। এইমাত্র যে ছলর বলর আওয়াজ তুলে পশ্চিমে গেল, গেল লাল খুরদা শাড়ি পড়ে বাঁশঝাড়-বেগনাঝাড়ের আড়ালে - আড়ালে, দেখে তো মনে হচ্ছে নতুন সাড়ি - সায়া পরিহিতা অনভ্যস্তা পায়ে হেঁটে গেল রসনাই। রসনা, রসনা। কিন্তু কেন হল এমনটা! কই রসনাদের গোরুবাগাল দামুর অশ্লীল আদিরসাত্মক রটনার আগে- পরেও তো এমনটা ছিল না? এই তো কিছুদিন আগে কথায় কথায় 'কাহিনী' - বলা আমাদের ঠাকুমার পারলৌকিক ঘাটক্রিয়াদি যখন হল, যখন সুবর্ণরেখা নদীর ঘাট থেকে মুন্ড ইত্যাদি সেরে মৃদঙ্গ - মধুরা কীর্তনীয়া সহযোগে আমাদের কাকা - কাকিমারা ফিরে আসছেন, আর আমরা তাঁর নাতিপুতিরা 'স্বর্গে বাতি দেখানোর' উদ্দেশ্যে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে গ্রামের মাথায় 'সন্ধ্যা-হব-হব' সময়ে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যুদ্গমন করছি, তখনও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেনি রসনা, তখনও সে আমারই সঙ্গে লেপ্টে থেকে একটা মোমবাতি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে নিভে যাবার প্রাক্ মুহূর্তেই আরেকটা জ্বেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করছিল, সেই তখনও তাকে 'গাঁয়ের কন্যা সিগ্নিনাকা' বলে তেমন পাত্তাই দিচ্ছিলাম না, আর আজ? আজ তো চারধার লালে লাল! যেদিকেই তাকাচ্ছি কেউ না কেউ লাল 'খুর্দা' শাড়ি পড়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, নয়ত বসে আছে রুম রুম! অন্য কেউ কেন হবে, রসনাই, রসনা রসনা। তবে কী কুড়িয়ে - পাওয়া - কাকের পালকটারই তুক্গুণ? ধুস্! তাই বা কেন হবে! এতক্ষণে মা - কাকিরা কাকের পালকটাকে হাত দিয়ে কুড়িয়ে ব্যাগে পুরেছি জানতে পারলে জোর করে মাথা ডুবিয়ে পুকুরে স্নান করাতেন, কত কী, অখাদ্য - কুখাদ্য - খাওয়া - কাকের পালক বলে কথা! মনে পড়তেই পালকটাকে ব্যাগ থেকে বের করে ছিঃ ধুঃ করে ছুঁড়ে ফেললমা। তাও যে দেখি লাল! ঐ তো, ঐ যে ঐ —খালপাড় ধরে পশ্চিমমুখো লাল 'খুরদা' শাড়ি পরে ছলর বলর হেঁটে চলেছে, ও কেন? ও কে গো? দুম্ করে ছোটকাকাকেই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'ছোট্কা, 'খুর্দা' বলে জায়গাটা কোথায়?' আমাদের ছোটকাকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, 'খুর্দা কেন হবে, আমরা তো যাচ্ছি খড়গপুর, খড়গপুর রেলইস্টিশানের ভাঙা রেলকামরায় তো ছোটপিসিমা— শুনলি ত—।' 'না, তা বলছি না, লোকে ঐ যে 'খুর্দা শাড়ি' বলে, তা ঐ খুর্দা জায়গাটা কোথায় যেখানে লাল-নীল -সবুজ খুর্দা শাড়ি উৎপন্ন হয়?' ছোটকাকা আমার মুখের দিকে খাকি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিলেন, ''আঃ''। তারপরই বললেন, ''আমি তো কখনও যাইনি তবে শুনেছি— ঐ কটক - ভুবনেশ্বরের ধারে - কাছে কোথাও হবে - টবে। খুর্দা শাড়ি-চাড়ি নিয়ে তোর এখন অত কীসের মাথাব্যথা? জল্দি পা চালা।''